বিশ্বমন্দাভাব : বদলে যাচ্ছে আমেরিকানদের জীবনযাত্রা

আফতাব চৌধুরী

আজকের দিনে সারা পৃথিবী যখন আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় আর্থিক সমস্যার সঙ্গে লড়ছে, তখন কেমন কাটছে চিরকালের বেহিসেবি আমেরিকানদের দিনকাল? আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতির বাজার বিশ্লেষণ করা নয়, এর জন্য রয়েছেন বড় বড় বিজ্ঞরা। বর্তমানের এ অর্থনৈতিক হাওয়ায় পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী দেশ ও বিশ্ব অর্থনীতির ঘাঁটি মার্কিন মুলুকের মাটিতে বসে 'সাদা'দের যে পরিবর্তিত জীবনধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটছে আজকাল, তার কিছু কিছু চিত্র তুলে ধরা আমার এ নিরীহ রচনার উদ্দেশ্য।

পানি সাদা হোক কি লাল-নীল, সবুজ যে রঙের হোক না কেন, তা দোকানের স্তরে স্তরে সাজানো বোতল থেকে আমেরিকানরা পান করতে ভালবাসেন, সে ঘরে হোক আর বাইরে হোক। এছাড়াও পানির বোতল ভর্তি মেশিনগুলো বসানো রয়েছে যত্রতত্র, তেষ্টা পেলে পয়সা ফেলো আর পানি খাও। কিন্তু আজকের চিত্র কিছুটা আলাদা। এ সমস্যাসঙ্কুল অর্থনৈতিক হাওয়ার দাপটে বোতলপ্রিয় সৌখিন সাহেবরাও নিজ নিজ কর্মস্থলে পানির ট্যাপ থেকে পানি ভরে পান করতে শুরু করেছেন। মজার কথা হল, এ দেশের টিভিতে টাকা বাঁচাবার উৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে পানির 'ফিল্টার'-এর বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকে দেশীদের নিজেদের মাটিতে ব্যবহৃত হওয়া আদি অকৃত্রিম 'ফিল্টার' আজ সাহেব সুবোর দৌলতে নতুন চমক পাচ্ছে!

বিজ্ঞাপনের কথা যখন উঠলই তখন না বলে পারছি না, এ দেশের মাটিতে আজকাল বিজ্ঞাপনের বিশাল 'বাজ ওয়ার্ড' (ঈলড়ড় ষমরঢ) হচ্ছে 'সেভ মানি' (ওটশণ মভণহ) অর্থাৎ টাকা বাঁচাও। এক বিখ্যাত পণ্য সংস্থা 'সেভ মানি লিভ বেটার' (ওটশণ মভণহ ফধশণ ঠর্ণণর) এ ধুয়ো তুলে মন্দার বাজারে বিক্রি বাড়িয়ে নিচ্ছে। শুধু একটি সংস্থা নয়, প্রায় সকলে এ প্রতিযোগিতার দৌড়ে নিজেদের বিক্রি-বাট্টা বাড়াতে 'ওটশণ মভণহ', 'টেহ ফগ্র', 'ঈলহ মভণ থর্ণ মভণ' ইত্যাদি নানা স্লোগান তুলে চলেছে। তার ফলস্বরূপ, যে নাক উঁচু আমেরিকানরা এককালে টাকা বাঁচাবার নামে নাক সিটকাতো, তারা দরদাম করে কেনাকাটা করাকে 'ফ্যাশন স্টেটমেন্ট' (এট্রদধমভ র্ওটণবণর্ভ) বানিয়ে নিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, আজকের দুনিয়ায় অফিস-আদালতে বসে কাপের পর কাপ কফি কিনে খাবার চল অনেক কমের দিকে। অনেকে কফির কৌটো বা 'কণট ঠটথ' কিনে এনে অফিসে বসে তা দিয়ে কষ্ট করে চা-কফি বানিয়ে খাচ্ছেন রোজ। পরিচিত এক আমেরিকান ভদ্রলোক সেদিন তার সহকর্মীকে বুঝাচ্ছিলেন, দোকান থেকে কফি কিনে খেয়ে এত দামি 'উমততণণ ঠরণটপ' বা কর্মবিরতি নেবার কি দরকার, তার বদলে বাড়ি থেকে চা-কফি ফ্লাস্কে ভরে নিয়ে এলে হয়, যখন ইচ্ছে গরম করে খাওয়া যায়। এ চা-কফি বা পানি খাবার ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে ছোট-খাটো মনে হলেও তা দিয়ে যখন কারো দিনের ৫-৬ ডলার খরচ বেঁচে যায়, তাতে এ ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক অবস্থায় আর ছোট-খাটো বিষয় থাকে না। সে জন্য হয়তো অনেক অফিসে আজকাল কর্মীদের টাকা বাঁচানোর 'টিপস' দেয়া হচ্ছে কর্মকর্তাদের তরফ থেকে। যেমন, কেনা স্যান্ডউইচের বদলে ব্রেড আর চিকেন এনে নিজেরা যে স্যান্ডউইচ বানাতে পারেন সে অবাক করা কথাটি সবাইকে বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে যারা বাক্সে সাজানো খাবার খেয়ে অভ্যস্ত তারা সকলে যে ভেবে-চিন্তে স্যান্ডউইচ 'রান্না' করে আনবেন, এমনটি ভাবা একেবারে অন্যায়। তাই একলাফে 'রান্না' করে খাবারে না নামলে অনেকে রেস্টুরেন্টের খাবারের বদলে রোজকার দুপুর বা রাতের খাবারের জন্য দোকানে প্রাপ্ত 'ফ্রোজেন ফুড' (এরমড়ণভ এমমঢ)-এ পেট ভরছেন, যা কিনা অনেকটা সস্তা পড়ে।

অবশ্য সকলে যে এক পথে চলবেন এমনটি নয়। তবে দেশের রেস্টুরেন্টগুলো কবে বন্ধ হয়ে আরেক আর্থিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করত। দেখা যাচ্ছে, কেউ হয়তো খাবার-দাবারের ব্যাপারে সমঝোতা করছেন না, কিন্তু অন্যভাবে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছেন ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের কথা ভেবে। সুখের কথা হল, 'সঞ্চয়' নামক বস্তুটি যে বেঁচে থাকতে পৃথিবীতে দরকার হয়, সে জ্ঞানটুকু 'রিসেশন' বা মন্দার বাজারে কমবেশি সকলেরই হয়ে গেছে।

এক মজার পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, খরচ কমাবার দৌড়ে মহিলারা আপাতত পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। নারী-পুরুষ মিলিয়ে শতকরা ৮৭ শতাংশ লোকে এখন দৈনিক জীবনযাপনের খরচাপাতি কমাবার পথে পা বাড়িয়েছেন, এর মধ্যে ৬০ শতাংশ জোর দিয়েছেন যাতায়াতের খরচ কমাবার দিকে। তাই অবাক হই না যখন দেখা যায় অফিসযাত্রী আমেরিকানরা এখন কর্মস্থলে যাতায়াতের জন্য মিলেমিশে নিজেদের গাড়ি ব্যবহার শুরু করেছেন প্রচুর সংখ্যায়। এ দেশের ভাষায় ব্যাপারটির নাম 'কার পুল' (উটর মেমফ)। এতে প্রত্যেকে নিজের নিজের আলাদা গাড়িতে কর্মস্থলে না গিয়ে কয়েকজন মিলে এক গাড়িতে করে যাতায়াত করছেন। এতদিন পর্যন্ত 'কার পুল' ব্যাপারটি আমাদের দেশিদের মধ্যে জনপ্রিয় বেশি ছিল। এবার আমেরিকান ভাইরা এতে যোগ দিয়েছেন নিজেদের পকেটের ওজন বাড়াতে।

ষাটোর্ধ্ব আমেরিকান নাগরিকরা এ আর্থিক ঝড়ের দাপট থেকে আজ বেঁচে নেই। যেহেতু অবসর গ্রহণের পর অনেকে ত্রিশ বা ততধিক বছর জীবিত থাকতে পারেন, সেহেতু অবসরের পর সীমিত আয়ে জীবনধারণ করতে তাদের খরচের দিকে যথেষ্ট নজর দিতে হয়। বর্তমান আর্থিক অবস্থায় নানা ধার-দেনার চাপে অবসরপ্রাপ্ত আবার চাকরির খোঁজে পথে নেমেছেন।

কিছুদিন পূর্বে ইউনিভার্সিটির এক অর্থনীতির অধ্যাপকের সাথে কথা হচ্ছিল। ভদ্রলোক বলছিলেন যখন আমেরিকার অর্থনীতির পালে ঝড়ো বাতাস লাগে স্কুল-কলেজগুলোর দারুণ পোয়াবারো হয়। চাকরি গেলে অনেকে আবার সরকারি সাহায্য নিয়ে পড়াশোনা করতে ভর্তি হয়ে যান। নতুন ডিগ্রী জুটিয়ে বাজার ভাল হতে তারা আবার চাকরি জোগাড় করে নেন। এবার তার অন্যথা হতে দেখা যাচ্ছে না। স্কুল-কলেজগুলো তাদের শ'খানেক 'কোর্স'-এর বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছে ক্রমাগত। নিশ্চিতভাবে প্রচুর লোক ভর্তি হচ্ছেন সেসব কোর্সে।

তবে মোটকথা, এ বাজারে মার্কিন মুলুকের নাগরিকরা সঞ্চয় করতে শিখুক আর না-ই শিখুক, এটি বুঝতে কোন অর্থনীতিবিদের দরকার হয় না যে আমেরিকার অর্থনীতির চাকা যত তাড়াতাড়ি ঘুরবে, বিশ্ব অর্থনীতির বাজার তত তাড়াতাড়ি ফিরবে। তাই দিনের শেষে জমা-খরচের হিসাব মিলাতে বিপর্যস্ত এ আমেরিকানদের মতো আমরা সকলে চাইব, ফিরে আসুক এদের স্বর্ণযুগ এবং বেঁচে থাকুক এ বেহিসাবি আমেরিকানরা।

❑ লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

রাজধানীকে যানজট মুক্ত করতে

পাতাল রেল প্রয়োজন মোসলে উদ্দীন মাসুদ

মহানগরী ঢাকায় যানজট এবং চলাচলে ঢাকাবাসীদের সীমাহীন দুর্ভোগ নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। দিন যত যাচ্ছে দুর্ভোগ তত বাড়ছে। দুর্ভোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিদিনই বিনষ্ট হচ্ছে মূল্যবান কর্মঘন্টা। দেখা যাচ্ছে রাজধানীর ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত যানবাহনের মিছিলে নতুন যানবাহন যুক্ত হচ্ছে প্রতিদিনই। একটি রাজধানী মহানগরীতে দ্রুত গতির কার, বাস ইত্যাদির পাশাপাশি ধীরগতির রিকশার এক অভিনব মিলন ক্ষেত্র হচ্ছে এই মহানগরী। মালামাল পরিবহনে ট্রাকের পাশাপাশি রিকশা-ভ্যান। ফুটপাতগুলো দখল করে নিয়েছে হকাররা। বহুতল ভবনগুলোয় গাড়ি পার্কিং-এর জায়গায় অবৈধ স্থাপনা, আন্তঃজেলা চেয়ার কোচগুলো দিবালোকেই শহরের অভ্যন্তরে চলাচল। ৫০-এর দশকে ঢাকা মহানগরীর লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত থেকে আট লাখ। আজ সেই রাজধানীর লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ। অর্থাৎ লোকসংখ্যা বেড়েছে। ২০ গুণ। তাই বলে ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট তো ২০ গুণ বাড়েনি। বেশি করে ট্রাফিক পুলিশ নামিয়ে ট্রাফিক সপ্তাহ উদযাপন করে নতুন করে অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সময়সূচি পরিবর্তন করে, এই সমস্যার কোন সমাধান হবে না, হচ্ছেও না। আগে খুঁজে বের করতে হবে যানজটের মূল কারণ। তারপর সেটা নিরসনে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। যানজটের অন্যতম কারণ হচ্ছে– ১. রাস্তার আয়তন থেকে তুলনামূলকভাবে গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ২. দিবালোকে শহরের ভিতরে আন্তঃজেলার গাড়ীর প্রবেশ, ৩. অবৈধ ও অতিরিক্ত রিকশা, ৪. সিটি করপোরেশন কর্তৃক অবৈধভাবে ফুটপাত ও রাস্তা ভাড়া, ৫. হকারদের দখলে ফুটপাত, ৬. ব্যস্ততম রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা ভবন মালিকদের স্বেচ্ছাচারিতা ও জনগণের আত্মসচেতনতার অভাব প্রভৃতি। সিটি

করপোরশনের অবৈধ রিকশা আটক অভিযান প্রশংসনীয়। সেই সাথে যানজট নিরসনে মহানগরী যানজট নিরসন পরিষদ (টিএসএফ-ঢাকা সড়ক) নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন-এর কার্যক্রম চোখে পড়ার মত। এই সংগঠন-এর চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন প্রায় ২ সহস্রাধিক নারী ও পুরুষ কর্মী নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। কোন বিত্তশালী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সামাজিক দায়বদ্ধতা এড়াতে আর্থিক সাপোর্ট দিলে সংগঠনটির কার্যক্রম আরো গতিশীল হতে পারে। তবে অতীব দুঃখের বিষয় আন্তঃজেলা বা দূরপাল্লা অর্ধ সহস্রাধিক বাস দিবালোকেই রাজধানীর ভিতরে চলাচল করলেও পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে না। ৬টি বিভাগীয় শহরকে কার্যকরী মহানগরী বা মেট্রো পলিটন শহর হিসেবে গড়ে তোলা। ইংল্যান্ডের মানুষজনকে সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য লন্ডন ছুটে আসতে হয় না। আমেরিকার লোকজনকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ওয়াশিংটন ছুটে যেতে হয় না। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের রাজধানীতে সেই রাজ্যের মানুষেরা তাদের ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করেন। আঞ্চলিক ভিত্তিতেই সেখানে চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে রিকশাওয়ালা হওয়ার জন্য ঢাকায় ছুটে আসতে হয়। যতদিন বিকেন্দ্রীকরণ না হচ্ছে ততদিন ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঠেকানো যাবে না। আর যতদিন আকাশ রেল বা পাতাল রেল না হবে ততদিন যানজটও ঠেকানো যাবে না।

জনসংখ্যা ও গাড়ির সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যানজট ক্রমাগত ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। স্বাভাবিক গতিতে চলতে না পারায় প্রতি বছর পুড়ে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকার জ্বালানি। নষ্ট হচ্ছে মানুষের মূল্যবান কর্মঘণ্টা। এই বিপুল ক্ষতির কোন হিসাব-নিকাশ নেই। বিশেষজ্ঞরা তো বটেই, সাধারণ মানুষও এখন নিশ্চিত, ঢাকার দুর্বিষহ যানজট দূর করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে পাতাল রেল। অথচ সেই অত্যাবশ্যকীয় প্রকল্পটি নিয়ে এখন আমলা ও পরিবহন ব্যবসায়ীদের মধ্যে কথা চালাচালিতে বন্দী হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে পরিবহন ব্যবসায়ীরা বতমান রেলের সময়সূচি নির্ধারণ নিয়েও বাণিজ্য করছে বলে অভিযোগ আছে। বাইরে থেকে ঢাকায় আসা এবং কাজ শেষে ঢাকা ত্যাগের সময় লক্ষ্য রেখে রেল কর্তৃপক্ষ ট্রেনের সময়সূচি মিলায় না। মানুষ ট্রেনের ওপর নির্ভর করতে পারছে না। নয়টার ট্রেন কয়টায় আসবে তাও অনিশ্চিত। বাধ্য হয়ে তারা বাস ও অন্যান্য যানবাহনের আশ্রয় দিচ্ছে। এ বাণিজ্যের সঙ্গে যারা জড়িত তারাই যে এখন পাতাল রেল প্রকল্প বাস্তবায়নের বিরোধিতা করছে– এমন সংশয় অমূলক নয়। সরকারকে এসব পাতানো ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ছিন্ন করতে হবে জটিলতার বহুমূখী জট। প্রাসঙ্গিক যে, সরকার ঘোষিত দিনবদল কতটা সফল হবে তা ভবিষ্যতই জানে। তবে যানজট কমিয়ে ঢাকা শহরকে বদলে দিতে হলে শিগগিরই চালু করতে হবে পাতাল রেল। একটি সমীক্ষা রিপোর্টে দেখা গেছে- যানজটের কারণে প্রতিদিন অপচয় হচ্ছে প্রায় ৩৩ কোটি টাকা, এ হিসাবে বছরে প্রায় বারো হাজার কোটি টাকা। যা দেশের জাতীয় বাজেটের প্রায় ১০ শতাংশ। জ্বালানির অপচয় ও কর্মঘণ্টার হিসাব ধরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবছর যে অর্থ অপচয় হচ্ছে তা দিয়েই পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব। তবে পদ্মা সেতু চালু হওয়ার সাথে সাথে রাজধানীতে যে যানবাহনের চাপ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে সেটা শতভাগ নিশ্চিত। তখন যানজট নিরসন অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই যে করেই হোক পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের আগে রাজধানীকে যানজটমুক্ত মহানগরী হিসেবে গড়ে তোলা দরকার। এজন্য পাতাল অত্যন্ত জরুরি।

লেখক : সংগঠক ও কলামিস্ট

শিক্ষানীতি ও মাদরাসা শিক্ষা

মো. ইয়াছিন মজুমদার

বাংলাদেশে প্রধানত দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে– (১) সাধারণ শিক্ষা, (২) মাদরাসা শিক্ষা। মাদরাসা শিক্ষা দু'ধরনের আলীয়া ধারা ও কাওমী ধারা। কাওমী ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাল আলেম হওয়ার মত বিষয় সিলেবাসে থাকলেও ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান বিষয় অপর্যাপ্ত। আলীয়া ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় আলেম তৈরীর মত সিলেবাসের সাথে সাথে ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞানসহ যুগোপযোগী সিলেবাস রয়েছে এমনকি সাধারণ বিষয়ের অতিরিক্ত বোঝায় ভারাক্রান্ত। সংস্কারের নামে ইংরেজী ২০০, বাংলা ২০০ নম্বর করাসহ সাধারণ

বিষয়ের বোঝা আরো চাপিয়ে দিয়ে মূল আরবী শিক্ষা তথা যোগ্য আলেম তৈরীর পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা বেশ কিছুদিন ধরে চলছে। ইতিপূর্বে ১০০ নম্বর করে বাংলা-ইংরেজী পড়েই মাদরাসা ছাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেধার পরিচয় দিয়েছে। বাংলা-ইংরেজী ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হলেও গ্রামারসহ সিলেবাস সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ অর্থাৎ বেশী পড়ে কম নম্বরের পরীক্ষা দিচ্ছে। সুতরাং আরবী বিষয় কমিয়ে ইংরেজী, বাংলা ২০০ নম্বর করে করার প্রয়োজন নেই। বর্তমান শিক্ষানীতিতে ৩০০ নম্বর আরবী, কুরআন, ফিকহ রেখে বাকি সব সাধারণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরবী ব্যাকরণের শব্দ গঠনগত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ানো হয় তা বাদ দেয়া হয়েছে। রাশিয়ার বোখারা এক সময় আলেম-ওলামার পদভাবে মুখরিত ছিল। শুধুমাত্র ইমাম বোখারী (রঃ)-এর চল্লিশ হাজার ছাত্র ছিল। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যাতে সেখানে বর্তমানে আলেম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ঠিক তেমনি বর্তমান শিক্ষানীতি কার্যকর হলে দেশে আদৌ কোন আলেম তৈরী হবে না। জ্ঞানহীন আলেম নামধারীদের কারণে ইসলাম মুখ থুবড়ে পড়বে।

এবার ব্রেন ড্রেন বিষয়ে কিছু আলোকপাত করছি। ব্রেন ড্রেন কথাটির মানে হল মেধা অপচয়। অর্থাৎ যে মেধা যে ক্ষেত্রে লাগালে বেশী উপকৃত হত তা অন্যত্র লাগানো বা নিজেদের মেধাবীদের অন্যত্র পাঠিয়ে অন্যস্থান থেকে মেধা ধার করা। বর্তমান মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়টি শতভাগ প্রযোজ্য। সরকার মাদরাসা শিক্ষাকে সমমান দিয়েছে কিন্তু বিসিএসসহ সরকারী কোন চাকরিতে মাদরাসা সিলেবাস কেন্দ্রিক কোন প্রশ্ন থাকে না। মাদরাসা ছাত্র পড়বে এক সিলেবাস, চাকরির জন্য পরীক্ষা দিবে অন্য সিলেবাসের উপর। ফলে প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে সে পিছিয়ে পড়বে। মেধাবী ছাত্ররা যারা শেষ পর্যন্ত মাদরাসায় অধ্যয়ন করলে যোগ্য আলেম হয়ে দেশ-জাতিকে কিছু দিতে পারত, ইসলামের মর্যাদা উজ্জ্বল করতে পারত তারা বিষয়টি বুঝতে পেরে দাখিল (এসএসসি) বা আলিম (এইচএসসি) পাসের পর মাদরাসা ত্যাগ করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছে। ফলে মাদরাসা মেধাশূন্য হচ্ছে, যোগ্য আলেম তৈরীর পথ রুদ্ধ হচ্ছে, সে সাথে মাদরাসা কাম্য ছাত্র সংখ্যা ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। এ অবস্থা চলতে থাকলে কোনভাবেই মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন হবে না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে শুধুমাত্র শিক্ষানীতির কোন ধারা পরিবর্তনের মতামত নয় বরং মাদরাসার কাওমী ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় গণিত, ইংরেজী, বিজ্ঞান সংযোজন করে তাদের স্বীকৃতি দান, আলীয়া ধারার সিলেবাস থেকে সাধারণ বিষয়ের অতিরিক্ত বোঝা কমানো। একটি স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন মাদরাসাসমূহকে তার অধীনে নেয়া, বিসিএসসহ সকল চাকরিতে মাদরাসা সিলেবাস কেন্দ্রিক আলাদা প্রশ্ন বা আলাদা কোটার ব্যবস্থার মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষা রক্ষার জোর দাবী করছি। মাদরাসার জন্য শিক্ষানীতিতে যে ৩০০ নম্বরের ইসলামী বিষয় রাখা হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে স্কুল-কলেজের জন্য এ সিলেবাস প্রযোজ্য। পূর্বেই বলেছি। শিক্ষা ব্যবস্থা দু'ধরনের– সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষা। সেক্ষেত্রে চাকরিসহ সকল ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র দু'ধরনের না হওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

❑ লেখক : প্রিন্সিপাল, ফুলগাঁও ফাজিল মাদরাসা লাকসাম, কুমিল্লা

শিক্ষা কারিকুলাম প্রসঙ্গ

মোহাম্মদ তাজাম্মুল হোসেন

২০০৯-এর জানুয়ারীতে গঠিত বর্তমান সরকার শিক্ষার কারিকুলাম যুগোপযোগী করার জন্য বেশ ব্যতিব্যস্ত বলে জানা গেছে। এ কারণে তারা একটি কমিটিও নিয়োগ করেছেন। সেই কমিটির সংগঠন নিয়ে এবং তাদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে শুরু থেকেই বিভিন্ন সমালোচনা শোনা যায়। সেসব সমালোচনার মধ্যে একটির কিছু জবাব ৪ অক্টোবর (০৯) একটি দৈনিকে খবর আকারে প্রকাশিত হয়েছে। জবাবটি দিয়েছেন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক। তার সে জবাবটির সার কথা আমি যা বুঝতে পারলাম তা হল এই যে, তারা মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখেই ওই শিক্ষা কারিকুলাম যুগোপযোগী করছেন। মন্দ কথা নয়। হয়ত ভাল কথাই। কিন্তু যে মূল বিষয়টি কারিকুলাম প্রশ্নে আসলে গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি একজন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক এবং অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ হিসেবে সব সময় হালে মনে করছি, তার কোন সদুত্তর যেন আমি পাচ্ছি না। তার বা সেই কমিটির কাছেও

পাইনি।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়টি মানুষের বা মানবজাতির জন্য নতুন কোন বিষয় নয়। সেই প্রথম দিন থেকেই মানুষের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো বলা যায় সহজাত। সহজাত অর্থে আমি এতটুকু বুঝাতে চাই যে সেই আদিকালে যখন কোন ধরনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায়তন গড়ে তোলেনি কোন ব্যক্তি বা গুণীজন, তখনও শিক্ষণীয়, গ্রহণীয়, বর্জনীয় বিষয়াদি মানব শিশু বড়দের বা মুরুব্বীদের কাছে শিখে নিয়েছিল বা মুরব্বীরাই তাদের পরিবারের ভিতরে শিখিয়েছিল, এখনও যেমন মা-বাবাই প্রথম শিক্ষণীয় বিষয়গুলো শিশুদের শেখায়। একে অনেকেই হাল আমলে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্যারিকুলামও বলে থাকে। এরপর যখন কেউ কেউ আনুষ্ঠানিক শিক্ষায়তন গড়ে তোলা শুরু করেন তখন বহুকাল তা মাত্র শিক্ষককেন্দ্রিক ছিল। ইসলামের ভাষায় যদি তাদের আমরা নবী-রাসূল বলে জানি। যখন সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল এর বিষয় চিন্তা করে দেখি তাহলেও আমরা বুঝতে পারি যে, তারা ছিলেন বড় বড় শিক্ষক, তাদের শিক্ষায়তন ছিল অনানুষ্ঠানিক এবং ছাত্ররা ছিল এখনকার ভাষায় এপ্রেনটিস ধরনের। ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতায় ইসলামের রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষায়তন গড়ে তোলেন। মদীনার মসজিদে নববীই ছিল সেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষায়তন। একই সাথে সেই শিক্ষায়তনই দিনরাত ৫টি বার নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সেই সালাত হয় মূলত জামাতে। আধ্যাত্মিক সংযোগ করার এবং তা অনুশীলন করার জন্য।

মানব সমাজে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কারিকুলাম বিস্তারের ইতিহাস খুঁজে দেখলে আরও দেখা যায় যে, ইউরোপ মুসলমানদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-কারিকুলাম অনুসরণ করেই কয়েকশ' বছর পর কোন কোন অবস্থানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা শুরু করে। সেসব প্রতিষ্ঠানই যখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বলা যায় পূর্ণতা লাভ করে তখনই তারা শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নত হয়। জাতি এবং রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ণতা পায়। সভ্য ও উন্নত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিও এভাবেই উন্নত হয়।

ইউরোপের পূর্ণ, উন্নত ও সভ্য শিক্ষা কারিকুলামের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল 'খৃস্টান ভদ্রলোক' তৈরি করা। আমেরিকাও সেই কারিকুলাম অনুসরণ করে একই 'খৃস্টান ভদ্রলোক' তৈরি করতে থাকে। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক জন ডিউই-এর পরিকল্পিত চিন্তার ছোঁয়াচ পেয়ে সেই আমেরিকার শিক্ষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত লক্ষ্য হয় 'প্রগতিশীল খৃস্টান ভদ্রলোক' তৈরির কারিকুলাম। বস্তুত এই 'খৃষ্টান ভদ্রলোকরা যখন পুঁজিবাদ এর লালনকারী এবং পরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মানুষ এবং জাতিতে পরিণত হয়, তখন দুনিয়ার অনেক স্থানেই ওদের বিরুদ্ধে বঞ্চনার ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়। সেই ক্ষোভের এক পর্যায়ে আসে বিশেষ করে মার্কসবাদ। সেই মার্কসবাদেরই প্রথম বড় বিপ্লবী সৃষ্টি সোভিয়েত ইউনিয়ন। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিশেষ মনন তৈরির জন্য যে কারিকুলাম সোভিয়েতরা শুরু করে তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তারা বলা যায় নামকরণ করে 'সোভিয়েত মানবকুল' তৈরি। কি ছিল সেই বিশেষ মানব তৈরির মূল কথা বা কারিকুলামের উদ্দেশ্য? সোভিয়েত মানুষ তৈরি করার প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ছিল, এক একজন কমিউনিস্ট তৈরি করা। কেননা, তা না হলে, তারা ঠিক করে যে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন করা সম্ভব হবে না। কমিউনিস্ট রাশিয়া তৈরি করার জন্য যে মানব সম্পদ তৈরি করা, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ দেয়া তার জন্য মার্কসবাদী ও নাস্তিক্যবাদী জনসম্পদ তাদের দর্শনে বা দৃষ্টিতে ছিল পূর্বশর্ত। একইভাবে গণচীন ১৯৫০-এর দশক থেকে যে শিক্ষা ক্যারিকুলাম প্রণয়ন করে তার লক্ষ্য ছিল সোভিয়েতের উদ্দেশ্যের প্রায় কাছাকাছি।

শিক্ষা কারিকুলামে ভূগোল, পরিবেশ, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, রাষ্ট্রীয় ধরন-নীতি ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় কোনটিই অগ্রাহ্যের বিষয় নয়। একই সাথে জীবনের জন্য কর্মমুখী প্রস্তুতির শিক্ষা কারিকুলামও ফেলনা কোন বিষয় নয়। কিন্তু এসব বিষয়ের যে কোন একটির দোহাই দিয়ে দেশের উঠতি প্রজন্মকে আধ্যাত্মবাদ থেকে বিচ্যুত করার এবং একই সাথে নাস্তিক তৈরীর জন্য সাধারণ শিক্ষার কারিকুলামকে কৌশলে সংগঠিত করার বিষয়টি বাংলাদেশে কতটুকু বিশেষ করে দেখে তাদের সুপারিশ প্রণয়ন করেছেন তা আমার জানা নেই। এ ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষা পুনর্গঠনই বড় বিষয় হতে পারে না, তার চেয়েও অতি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার কারিকুলাম পুনর্গঠনের জরুরী আবশ্যকীয় বিষয়টিও।

❑ লেখক : সাংবাদিক

বাংলাদেশ বেতার ও প্রাসঙ্গিক কথা

মো. আব্দুর রউফ

জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ বেতার স্বীয় ঐতিহ্যে অম্লান। এই ঐতিহ্য ১৯৩৯ সাল থেকে কুসুম-কোমল পথ ধরে অনায়াসে বর্তমান অবস্থায় আসেনি। অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেই এসেছে। বেতারের মূলত ৪টি উইং অনুষ্ঠান, বার্তা, প্রকৌশল ও প্রশাসন। সবকটি উইং-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অত্যন্ত নিষ্ঠা, যোগ্যতা ও সততার সাথে কোন সুবিধা প্রাপ্তির আশা না করে নিজ উদ্যোগে দায়িত্ববোধ থেকে এবং সৃষ্টির আনন্দে হাসিমুখে রাত-দিন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু পত্রিকায় এই মহতী প্রতিষ্ঠান ও এর সর্বস্তরের নিবেদিত কর্মীদের বিরুদ্ধে অবসরপ্রাপ্ত কিছু সিনিয়র কর্মকর্তা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য উপস্থাপন করছেন। অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল বিভাগের সাথে সমন্বয় করে প্রশাসন বিভাগ শৃংখলা ও অর্থের বিষয়গুলো দেখেন। অনুষ্ঠান বিভাগের প্রধান উপ-মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান), বার্তা বিভাগের প্রধান উপ-মহাপরিচালক (বার্তা) এবং প্রকৌশল বিভাগের শীর্ষকর্তা, প্রধান প্রকৌশলী। আর এই চারটি বিভাগের মধ্যে শক্তিশালী টিমওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য এবং সরকারের সাথে বেতার কর্মীদের সেতুবন্ধন তৈরি ও বিভিন্ন নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবার শীর্ষে রয়েছেন মহাপরিচালক। অনুষ্ঠান ও বার্তা শাখায় অনুষ্ঠানের কাজে সহযোগিতার জন্য নিজস্ব শিল্পী ও অনিয়মিত শিল্পী রয়েছেন। নিজস্ব শিল্পীর মধ্যে অনুষ্ঠান ঘোষক/ঘোষিকা/সংবাদ পাঠক/পাণ্ডুলিপি লেখক/সংগীত প্রযোজক/নাট্য প্রযোজক ও বিভিন্ন যন্ত্রবাদক রয়েছে।

বাংলাদেশ বেতার মূলত সরকারী অর্থে জনস্বার্থে পরিচালিত পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিং প্রতিষ্ঠান। এই মাধ্যমকে সরকারের সাথে জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে দেখা যেতে পারে। তাই সরকার নির্ধারিত প্রচার নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। ইচ্ছা করলেও যে কেউ যা খুশি তা প্রচার করতে পারেন না। যা বলে রাখা ভাল, বেতারের জন্মলগ্ন থেকে প্রতিদিন অফিস শুরুর পরপরই সকল অফিসার অনুষ্ঠান সভায় আগের দিনের প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভাল-মন্দ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে থাকেন। এরপর আগামী দিনে কি প্রচার করা হবে তার সকল লিখিত তালিকা (কিউসীট) অনুষ্ঠান সভায় উপস্থাপন করা হয়। উপস্থিত কর্মকর্তারা প্রচারিতব্য গান, নাটক, কথিকা, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি এবং এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, শ্লোগান, স্পট, জিংগেল ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করে থাকেন। প্রসঙ্গত বলতে চাই– বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ সচেতন নাগরিক হিসেবে কোন না কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক হতেই পারেন কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, প্রযোজনা ও প্রচারের ক্ষেত্রে বেতারে দীর্ঘদিনের অনুসৃত রীতির কারণে পেশাদারিত্বের সাথেই তারা কর্ম সম্পাদন করেন। তাদের এর ব্যত্যয় ঘটানো বা সরকারী বিধি-বিধানের বাইরে যাওয়ার কোনরকম সুযোগ নেই। সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশ বেতার এখনও সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ ইলেকট্রনিক সরকারী প্রচার মাধ্যম হিসেবে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর সেবা করে চলেছে। জাতির সকল ক্রান্তিকালে বাংলাদেশ বেতার বিরতিহীন অধিবেশনের মাধ্যমে সারাক্ষণ জনগণের পাশে থেকেছে। '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বেতারের ঐতিহাসিক ভূমিকা সর্বজনবিদিত। প্রতিমাসে বেতারের প্রচারিত অনুষ্ঠানমালা সার-সংক্ষেপ সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

এই মুহূর্তে বর্তমান সরকারের নিকট সবিনয়ে অনুরোধ করতে চাই– প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে কক্সবাজার ও বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অনুষ্ঠান সম্প্রচার বিস্তৃত করতে কক্সবাজার ও বরিশাল কেন্দ্রের ট্রান্সমিটার কমপক্ষে ৫০ কিলোহার্জ থেকে ১০০ কিলোহার্জ সম্প্রসারণ করা জরুরী। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন হতে প্রতিটি কেন্দ্রের ট্রান্সমিটার ৫০-১০০ কিলোহার্জ করার ব্যবস্থা নিতে বেতার কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম শুরু করেছে। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সমর্থন পাওয়া না গেলে এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি থেকে অনুমতি পাওয়া যাবে না। আগামীতে দেশব্যাপী ডিজিটাল সিস্টেম এফএম চালু হচ্ছে যা সত্যিকারভাবে সুখবর। কিন্তু কেন্দ্রসমূহে এএম-এর (মধ্যম তরঙ্গ) অনুষ্ঠান হাই ফ্রিকোয়েন্সী ট্রান্সমিটার-এর মাধ্যমে প্রচার অব্যাহত রাখা জরুরী।

রেডিও একটি সাউন্ড মিডিয়াম। শব্দের মাধ্যমে একটি বিষয়কে জনগণের কাছে সঠিকভাবে প্রকাশ করা কঠিন। ভিজ্যুয়াল মিডিয়া নিঃশব্দে একটি ক্যামেরা প্যান করলে যে কোন দর্শক তা দেখে বুঝে নিতে পারে। কিন্তু ওই দৃশ্যটি শব্দের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা কিছুটা হলেও কঠিন। তাই এই মিডিয়ামের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতিনিয়ত অর্জনের দিকে খেয়াল করতে হবে। এই মিডিয়াতে শিক্ষার শেষ নেই। নতুন চেতনা ও ভাবনা দিয়ে অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তোলার চিন্তা সবসময় করতে হয়। কারণ শ্রোতাদের প্রত্যাশা থাকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন অনুষ্ঠান শোনার, কেননা মানুষের চাহিদা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়ে থাকে। (চলবে)

❑ লেখক : উপ-মহাপরিচালক, অনুষ্ঠান (দায়িত্বে), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা

হজ : বিশ্ব মুসলিমের সম্মিলন

হুসেইন বিন আব্দুল মতিন

বিশ্বের প্রতিটি পদার্থের সঙ্গে প্রতিটি পদার্থের একটি আকর্ষণ আছে এবং এদের মধ্যে সুসমন্বয় আছে। এ আকর্ষণ ও সমন্বয় না থাকলে এ বিশ্ব টিকে থাকত না। যে অদৃশ্য শক্তির টানে একটি অপরটিকে আকৃষ্ট করে সেই শক্তিকেই প্রেম, প্রীতি বা ভালবাসা বলে। আল্লাহর প্রেমে মুগ্ধ হয়েই রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন : ‘পরলোকে আল্লাহ বলবেন আমার প্রেমিকগণ কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়াদান করবো, আমার ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া নাই’ (মুসলিম শরীফ)। প্রেমিকগণ ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে ভুখা পেটে আল্লাহর ধ্যান-খেয়ালের সুধা পান করে যে তৃপ্তি পায় সে তৃপ্তি আড়ম্বরপূর্ণ রাজপ্রাসাদেও খুঁজে পাওয়া যায় না। হীরক, মণি, কাঞ্চনের লোভে তারা লোভী নয়, নারীর সুবিন্যস্ত কেশ, রূপালী দাঁতের হাসি ও প্রেমের উষ্ণ চাহনীতেও তারা মগ্ন নয়, রাজার ভুষণ-ভোগ বিলাসের পরমাকৃতি সামগ্রীতে তারা তুষ্ট নয়। তুষ্ট শুধু সেই আল্লাহ নামের অমৃত সুধাপানে। কথায় বলে, জ্ঞানের গভীরতা ও বুদ্ধির দৌড় যেখানে শেষ হয়ে যায়, সেখান থেকে শুরু হয় প্রেমের বিজয় যাত্রা। পবিত্র হজের প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের মাঝে মূর্ত হয়ে উঠেছে ভালবাসার মনোরম দৃশ্য, প্রেমের অপূর্ব মহিমা, ভালবাসার নিখুঁত ছবি, যথার্থ প্রেমের অনুপম আদর্শ। তাই বলি পবিত্র হজ হচ্ছে প্রেমময়ের উদ্দেশ্যে নিখাদ প্রেমিকের নিখুঁত প্রেমের অভিযাত্রা।

অদৃশ্য জগত থেকে কে যেন বলে দিয়েছে, সৌদিআরবের বুকচিরে বয়ে চলেছে প্রিয়তমের সকরুণ ভালবাসার স্বচ্ছ সুনীল ফল্গুধারা, দূর আরবের মরু সাহারায় পবিত্র মক্কা নগরীর বুকে বিরাজমান রয়েছে তার পরম প্রিয়তমের সুরম্য নিকেতন ‘কাবাঘর’। ইরশাদ হচ্ছে, ‘যারা বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম আল্লাহতায়ালা তাদের ওপর হজ ফরজ করে দিয়েছেন’ (আল ইমরান আয়াত নং-৩)।

হজের আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা, সন্ধান করা। শরীয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য কাবা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা। হজ কখন ফরজ করা হয়েছিল? অধিকাংশ উলামায়ে-কেরামের মতে, নবম হিজরীর শেষের দিকে হজ ফরজ হয়েছিল। ‘(হাশিয়ায়ে ইবনে আবে দীন, আল ফিকহুল ইসলামী ও আদিতুল্লাতু ড. যুহায়লী)’ স্মর্তব্য যে, হজের অধিকাংশ আমল ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ, তদীয় পুণ্যবতী স্ত্রী বিবি হাজেরা ও পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-এর প্রেমেরই স্মৃতিচারণ। পরম প্রিয়তমের জয়গানই আজ তার জপমালা ‘লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’ বলে ব্যাকুল হৃদয়ে উপস্থিত হচ্ছে প্রেমময়ের স্মৃতিঘেরা প্রতিটি মঞ্জিলে।

এ যেন ঐক্য-সংহতি, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্বের বিশ্বজনীন এক ইসলামী কনফারেন্স, যা প্রতিবছর বিশ্বের মুসলমানদের মিলনকেন্দ্র। ওহির উৎসস্থল মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর দূর দেশ থেকে আমির, ফকির, ছোট, বড়, উঁচু-নীচু, কালো, গৌর, মুনিব, ক্রীতদাস, রাজা, প্রজা সকলেই হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ বিরোধ, কলঙ্ক, কালিমার ছোঁয়া থেকে বহু দূরে অবস্থান করে এখানে সমবেত হয়। ইরশাদ হচ্ছে, ‘আপনি লোকদের হজের ঘোষণা করুন। তারা পথব্রজেও আরোহন করে দূর দেশ থেকে এখানে আসবে’ (আল কোরআন)।

তখন মানুষের অবস্থা এমন হবে যে, আজ শত্রু ও মিত্র, মানুষ তো মানুষ, বনের পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গের সঙ্গেও আজ তাদের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। ইরশাদ হচ্ছে যে, 'তোমরা এহরাম অবস্থায় যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ তোমাদের ওপর সমুদ্রে শিকার করাও হারাম করা হয়েছে।' হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে রাসূল (সা.) পর্যন্ত সকল নবীগণ তাদের যুগে এ পবিত্র ভূমি কাবাঘরকে আল্লাহর হুকুমে তাওয়াফ করেছেন। সেই আদম (আ.)-এর যুগের বিশ্বজনীন প্রেমিক সম্মেলনের প্রতিধ্বনি আজও ধ্বনিত হচ্ছে। হাজীগণ ক্রমেই প্রেমময়ের নিকেতন 'কাবাঘরের' যতই নিকটবর্তী হয় ততই উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, উপচেপড়া প্রেমের দুঃসহ জ্বালা, উথলে ওঠে ভালবাসার এক প্লাবন। আল্লাহতায়ালা সকলকে বারবার হারামাইন শরীফাইনের যিয়ারতের তাওফিক দান করুক। সাথে সাথে পার্থিব জগতের অবান্তর ক্ষণস্থায়ী বস্তুতান্ত্রিক প্রেমে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট না করে শাশ্বত প্রেমময়ের প্রেমিক হওয়ার তাওফিক দান করুক। আমিন।

❑ শ্রীপুর, কানাইঘাট, সিলেট থেকে